এইভাবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধ চলেছিল ৪ বছরের অধিক সময় ধরে। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্ব রাজনীতির ভারসাম্য নতুন করে রচিত হল। ইংল্যান্ড প্রথম থেকে চেষ্টা করছিল যুদ্ধকে সীমিত রাখতে। জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি, অস্ট্রিয়া সকলের কাছে ইংল্যান্ডের প্রস্তাব ছিল যে সার্বিয়ার প্রতি অতিরিক্ত রূঢ় হয়ে কেউ যেন ইউরোপীয় যুদ্ধের ঝুঁকি না নেয়। বলকান অঞ্চলের সমস্যা যেন বলকান অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে যেমনটি ছিল ১৯১২ ও ১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধের সময় তা নিশ্চিত করার জন্য ইংল্যান্ডের প্রস্তাব ছিল ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন হোক যেখানে এ বিষয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারিত হবে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া জানাল যে সেরাজেভোর ঘটনাটি অস্ট্রিয়ার নিজস্ব ব্যাপার, তা নিয়ে তারা অন্য দেশের উৎসাহকে গ্রাহ্য মনে করেন না। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে সার্বিয়ার ব্যাপারে অস্ট্রিয়াকে স্বাধীন প্রয়াস নেওয়ার সুযোগ তারা করে দিতে চাইছিল। ইংল্যান্ডের শান্তি প্রয়াস প্রথমেই ব্যাহত হল। পরে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখনও ইংল্যান্ড ফ্রান্স ও জার্মানির কাছে জানতে চেয়েছিল যে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা (Neutrality) মেনে নিয়ে তার অখণ্ডতাকে (integrity) তারা সম্মান জানাবে কিনা। এই বিষয়ে জার্মানি কোন সঠিক উত্তর না দিয়ে সাময়িকভবে সমস্যাটি এড়িয়ে গেল। ২ আগস্ট জার্মানি লুক্সেমবুর্গ (Luxemburg) আক্রমণ করল এবং এর ঠিক পরেই জার্মানি বেলজিয়ামে তার সৈন্য প্রবেশ করাল। ব্রিটেন চিরকালই বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতাকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে। ফলে ৪ আগস্ট মধ্যরাত থেকে জার্মানি আর ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। ইংল্যান্ড ঘোষণা করল যে সে যুদ্ধ করছে এই নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে কোন ছোট রাষ্ট্র অন্য কোন ক্ষমতাশালী বড় রাষ্ট্রের দ্বারা নিষ্পেষিত না হয়— "... we are fighting to vesidicate the principle that small nationalities are not to be crushed...by the arbitrary will of a strong and overmastering Power"। অন্যদিকে জার্মানি ঘোষণা করল যে তারা তাদের শান্তিপূর্ণ শ্রমের ফসল, তাদের মহান অতীতের ঐতিহ্য এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য যুদ্ধ করছে— "We are fighting for the fruit of our peaceful labour, for the inheritance bequeathed to us by a great past, and for our future. শুধু তাই নয় এই ঘোষণায় আরও বলা হয়েছিল যে জার্মান জাতীয় জীবনে এক মহালগ্ন উপস্থিত হয়েছে, তার সৈনাবাহিনী ছড়িয়ে গেছে রণাঙ্গানে, তার নৌবহর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত, আর তাদের সবার পেছনে রয়েছে জার্মান নীতি— "The great hour of trial for our nation has now struck ... our army is in the field, our flect is ready for action—and behind them, the entire German nation। এইভাবে জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা—জার্মানি ও ইংল্যান্ডের দুই বিপরীত দৃষ্টিকোণ নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিভিত্তিক আন্তর্জাতিকতা এই দুইয়ের লড়াই প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই থেমে থাকেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তা গড়িয়েছিল।

৪(গ).৮ যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেশীরভাগ লড়াই হয়েছিল ছয়টি প্রধান ক্ষেত্রে। এইগুলি হল পশ্চিম সীমান্ত (Western Front)— বেলজিয়াম উপকূলভাগ থেকে ফ্রান্স হয়ে সুইজারল্যান্ডের সীমানা পর্যন্ত দীর্ঘ কিন্তু অপ্রসারিত অঞ্চল; পূর্ব সীমান্ত (Eastern Front) বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত অঞ্চল যা কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে, অর্থাৎ পশ্চিম সীমান্ত থেকে অনেক স্থিতিস্থাপক অঞ্চল (a flexible line); ১৯১৫ সালের ডারডানেলস (the Durdanelles in 1915); স্যালোনিকা (Salonika) সমেত বলকান অঞ্চল (the Balkans, including Salonika); প্যালেস্টাইন ও বর্তমান যাকে ইরাক বলা হয় সেই অঞ্চল সমেত নিকট প্রাচ্য বা

মধ্যপ্রাচ্য (the Near East, including Palestine and what is now Iraq); এবং অস্ট্রিয়া ইটালির সীমানা (the Austro-Italian border)। পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ ছিল প্রায় নিশ্চল (static) কোন পক্ষই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দু-চার মাইলের বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। পূর্ব সীমান্তে জার্মান ও অস্ট্রিয়ানরা শুরুতে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল ১৯২৬ সালে রুশ সেনাপতি ব্রুশিলভ (Brussilov) অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯১৭ সালে জারতন্ত্রের পতন হয় এবং বিপ্লবী সরকার শান্তিস্থাপন করতে চাইলে জার্মানি রাশিয়ার উপর ব্রেস্ট-লিটভস্কের (Brest-Litovsk) এর নির্মম চুক্তি চাপিয়ে দেয়। পূর্বসীমান্তে শান্তি ফেরে।

ডারডানেলস অভিযান উইনস্টন চার্চিলের (Winston Churchill) কল্পনাপ্রসূত। চার্চিল চেয়েছিলেন যে নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনীকে একসঙ্গে ব্যবহার করে দ্রুত কনস্টাটিনোপল অধিকার করে তুরস্ককে যুদ্ধের থেকে হটিয়ে দিতে যাতে রাশিয়ার উপর চাপ কমে যায়। কিন্তু তা করার জন্য নৌ ও স্থলবাহিনীর যে যোগাযোগ (Co-ordination) দরকার ছিল তা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া নেতৃত্বেরও অভাব ছিল—সেই নেতৃত্ব যে দৃঢ়তা ও সাহস দেখাতে পারবে। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনী ডার্ডনেলস্ (Durdanelles) অঞ্চল ত্যাগ করে চলে যায়। বলকান অঞ্চলে প্রথমে সার্বিয়া কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিল কিন্তু পরে অস্ট্রিয়ান জার্মান ও বুলগেরিয়ান বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে সার্বদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে যেতে থাকে। ১৯১৮ সালে সার্বিয়া পরাজিত হয়।

নিকট বা মধ্য প্রাচ্যে ব্রিটিশ ও তাদের মিত্রশক্তি প্রথম থেকে জয়লাভ করতে থাকে। তারা প্যালেস্টাইন থেকে তুর্কীদের হটিয়ে দেয় এবং মেসোপটেমিয়ার উপর তুর্কীদের প্রাধান্য ভেঙ্গে দেয়। অস্ট্রিয়া ও ইটালির সীমানায় যুদ্ধের প্রথম দুবছর বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ১৯১৭ সালে ইটালিয়ানরা ক্যাপোরিটো (Caporetto) নামক স্থানে ভীষণভাবে পরাজিত হয়। পরের বছর ভিট্টোরিও ভেনেটো (Vittorio Veneto) নামক স্থানে অস্ট্রিয়ানদের একইরকম ভাবে পরাজিত করে। আফ্রিকাতে জার্মানি টাঙ্গানাইকা ও জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সমেত তার উপনিবেশগুলিতে পরাজিত হয়।

১৯১৬ সালে ৩১ মে ব্রিটিশ ও জার্মান নৌবাহিনী জুটল্যান্ড (Jutland) নামক স্থানে এক বিরাট জলযুদ্ধে লিপ্ত হয়, কিন্তু তার কোন বিশেষ ফলাফল হয়নি। যে কটি যুদ্ধ অনড় (Stalemate) ছিল এটি তার মধ্যে একটি। তবে এই যুদ্ধের পর জার্মান সামুদ্রিক বাহিনী (German High Seas Fleet) আর উত্তর সাগরে (North Sea) বা আটলান্টিক সাগরে (Atlantic Sea) প্রবেশ করতে সাহস করেনি। জার্মানি সামুদ্রিক যুদ্ধে ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। সে সাবমেরিন ব্যবহার করে যুদ্ধকে জলের তলায় নিয়ে গিয়েছিল। যে সব জাহাজ নানা খাদ্যসম্ভার ও রণসামগ্রী নিয়ে ইংল্যান্ডের দিকে অগ্রসর হত তাকে জলের তলা থেকে গোপনে আক্রমণ করত। ফলে ইংল্যান্ডে প্রধান প্রধান বস্তুর যোগান ও সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে "জার্মানি ব্রিটেনকে প্রায় অনশনের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।" এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে ইংল্যান্ড কনভয় ব্যবস্থা (Convoy System) চালু করে আত্মরক্ষা করে। কনভয় ব্যবস্থা হল বাণিজ্যিক জাহাজ (Merchant ships) রিলে করে (in relays) যাবে আর চারাপাশে তার নিরাপত্তা বিধান করবে যুদ্ধজাহাজ।

যুদ্ধের পরিণতিতে কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ইউরোপের বাইরে থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান মিত্রশক্তির সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়, কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গ তাদের চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙ্গে পড়ে। চীনে জার্মান উপনিবেশগুলি দখল করে নেয় জাপান। একইভাবে জার্মানির প্রশান্ত

মহাসাগরীয় উপনিবেশগুলি অধিকার করে নেয় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সেনাবাহিনী। ১৯১৬ সালের মধ্যে জার্মানির আফ্রিকা-উপনিবেশগুলি সমস্তই ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে মিত্রশক্তি বাহিনী আফ্রিকায় লড়াই করছিল তাদের নেতৃত্বে ছিলেন দুই দক্ষিণ আফ্রিকার সেনাপতি দক্ষিণ-পশ্চিমে বোথা (Botha) এবং পূর্ব দিকে স্মাটস্ (Smuts)।

৪(গ).৯ জার্মানির নৌযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে জার্মানি ইংল্যান্ডকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছিল তার নৌবাদের (Navalism) প্রকল্প দিয়ে। অতএব নৌবাদের ফল জার্মান নৌবাহিনী কি রকম ফললাভ করতে পেরেছিল তা একটু জানা দরকার। যুদ্ধের শুরুতে জার্মানির বাণিজ্যিক জাহাজগুলি দেশের জন্য যথেষ্ট কাজ করেছিল। তখন তার সামুদ্রিক নৌবাহিনী কিয়েল ক্যানেলে (Kiel Canal) আটকে ছিল। জার্মানির লক্ষ্যই ছিল ইংল্যান্ড ও মিত্রশক্তির বাণিজ্যকে আক্রমণ করা এবং পূর্বদিকে যাবতীয় জলাশয়ে এ কাজ জার্মান জাহাজ ভালভাবেই করেছিল। যুদ্ধের একটি বিবরণ বলছে "A few German commerce raiders led a spectacular career in eastern waters before being captured or destroyed." উত্তর সাগরে তিনটি ব্রিটিশ ক্রুজারকে (cruisers) জার্মান সাবমেরিন ডুবিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে করোনেল (Coronel) নামক স্থানে একটি জার্মান স্কোয়ড্রন ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাজিত করে। ১৯১৪ সালের ৮ ডিসেম্বর সেই স্কোয়াড্রন ফক্‌ল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের (Falkland Islands) যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৯১৬ সালের ৩১ মে ড্যানিশ উপকূলের (Danish Coast) অদূরে ব্রিটিশ গৃহ নৌবাহিনীর (British home fleet) সঙ্গে জার্মান বাহিনীর লড়াই হয়। এইটিই জুটল্যান্ডের নৌযুদ্ধ নামে বিখ্যাত। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর ক্ষতি বেশী হয়েছিল, কিন্তু জার্মান বাহিনী এতই ভেঙ্গে গিয়েছিল যে আর কোন বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। জলের তলায় যুদ্ধে অবশ্য জার্মানি পারদর্শিতা দেখিয়েছিল। জলযুদ্ধে জার্মানির প্রধান অস্ত্র ছিল সাবমেরিন (Submarines)। তা দিয়ে মিত্র শক্তির সরবরাহ ব্যবস্থাকে জার্মানি ভেঙ্গে দিয়েছিল। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জার্মানি সমস্ত ব্রিটিশ ও ফরাসী উপকূল অঞ্চলের উপর ব্লকেড (blockade) ঘোষণা করে। এই ব্লকেডের ভেতর যে কোন জাহাজ—এমনকি নিরপেক্ষ জাহাজকেও সে আক্রমণ করেছে। ১৯১৬ সালে কম করে একশটি জাহাজকে সে সাবমেরিনের সাহায্যে জলের তলায় ডুবিয়ে দিয়ে (এদের বেশীরভাগটা নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ) নিজের নৌ-আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল।

৪(গ).১০ যুদ্ধ শেষের যুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বলা হয়েছে 'যুদ্ধ শেষের যুদ্ধ'— 'the war to end war'। কিন্তু সে যুদ্ধেই জড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্রগুলি, এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশগুলি, ভারতবর্ষ, মিশর, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, যুদ্ধের রথ চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিকট প্রাচ্যে ও সুদূর প্রাচ্যে (Near and Far East), চীনে ও জাপানে, যুদ্ধ স্পর্শ করেছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলিকে যুদ্ধের অভূতপূর্ব বিস্তার হয়েছিল স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে—এমনকি জলের তলায়। যুদ্ধ যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আধুনিক প্রচার ব্যবস্থার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আয়োজন, যুদ্ধ আত্মসাৎ করে নিয়েছিল সমস্ত

শিল্পকে, সমস্ত মানুষকে—সৈনিক, নাবিক বৈমানিককে, সাদা পোষাকের বেসরকারী মানুষকে (civilian) আর পোষাকধারী মানুষকেও (men in uniform)। যুদ্ধে তলিয়ে গিয়েছিল শ্বেত মানুষ, পীত মানুষ, তাম্রকায় (Brown) ও কৃষ্ণকায় (Black) মানুষ। যুদ্ধ বাড়িয়ে দিয়েছিল জয়ের আকাঙ্ক্ষা, আত্মরক্ষার প্রবণতা ও ধ্বংসের বাসনা। যুদ্ধের তাগিদে মানুষ তৈরি করেছিল নানা ধরনের নতুন অস্ত্র, ভেঙ্গে ছিল নানা আন্তর্জাতিক নীতি, তৈরি করেছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নানা নজির। যুদ্ধ ভেঙ্গে দিয়েছিল মানুষের চিরায়ত নানা বিশ্বাসকে। যুদ্ধ ধ্বংস করেছিল পৃথিবীর বিপুল মানুষকে, নষ্ট করেছিল প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ, মানুষের নানা অনন্য সৃষ্টি। এই হল 'যুদ্ধ শেষের যুদ্ধ'। যুদ্ধের শুরুতে মানুষ ভেবেছিল যে যুদ্ধ বেশীদিন চলবে না কারণ আধুনিক অর্থনীতির জটিলতা আর রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের পরস্পর নির্ভর সম্পর্কে বেশীদিন আপৎকালীন পরিস্থিতির মধ্যে নিমজ্জিত রাখা যায় না। ইউরোপের মানুষ দেখেছিল যে ফ্র্যাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ ছয় মাসের একটু বেশি সময়ে চলেছিল, অস্ট্রো প্রশিয়ান যুদ্ধ চলেছিল ছয় সপ্তাহ। তারা দেখেছিল মরোক্কোর সংকট যুদ্ধ ডাকেনি, বলকান যুদ্ধ বৃহৎ ইউরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হয়নি। তাদের ধারণা ছিল এই যুদ্ধও বেশিদিন চলবে না। কিন্তু সে ধারণা ব্যর্থ করে যখন যুদ্ধের রথ অনির্দেশ্য পথে এগুতে লাগল তখন যন্ত্রণাবিদ্ধ মন নিয়ে তারা এবং তাদের সাথে পৃথিবীর মানুষ তাদের সিদ্ধান্তগুলিকে একের পর এক বদলাতে লাগল। নতুন যুদ্ধজাহাজ, নতুন ক্ষেপণাস্ত্র যেমন হাওউইৎজার (Howitzers), নতুন জলতলের যান যেমন সাবমেরিন (Submarine), বিষাক্ত গ্যাস, পনেরো মাইল দূরের জিনিষকে ধ্বংস করতে পারে এমন একটা গোলা নিক্ষেপকারী কামান এবং নতুন সিজ গান (Siege-gun) নামে জার্মান অস্ত্র পৃথিবীময় আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল। আতঙ্ক আর ভয়, অনুশোচনা ও হতাশাই যুদ্ধ শেষের যুদ্ধের সবচেয়ে বড় পরিণতি।

৪(গ).১১ যুদ্ধের দায়িত্ব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে পর বিজয়ী মিত্রশক্তি এই ধারণা প্রচার করেছিল যে জার্মানি ও কেন্দ্রীয় শক্তিরাই এই যুদ্ধের জন্য দায়ী। তারাই বলকানের এই সীমিত সমস্যাকে ইউরোপীয় সমস্যায় পরিণত করতে সাহায্য করেছিল এবং একটি স্থানীয় যুদ্ধের সম্ভাবনাকে একটি মহাদেশীয় পরিস্থিতির সংসোধনের (revision) সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেছিল। এই রকম ধারণা অনেকদিন চালু থাকলেও শেষপর্যন্ত ঐতিহাসিকরা একে সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য মনে করেননি। তারা বলেন যে রাজনীতিবিদ ও সরকারের অভিসন্ধি সরকারি দলিলে প্রতিফলিত হলেও তা সম্পূর্ণভাবে সেখানে প্রকাশ পায়না। তাছাড়া যুদ্ধের পেছনে বেসরকারি সংস্থা, পুঁজিবাদীদের ভূমিকা, ও জনগণের গতি ও চাহিদাকে সঠিকভাবে নিরূপণ না করে কোন যুদ্ধের দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে বণ্টন করা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে একটি বড় প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা এস. বি. ফে (S B. Fay. *The origins of the First World War*) মেনে নিতে পারেননি জার্মানির উপর একতরফা যুদ্ধাপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ভার্সাই চুক্তিতে (Treaty of Versailles) তাকে নির্মম শাস্তি দেওয়া ঘটনা। অন্য দিকে জার্মান ঐতিহাসিক ফ্রিৎস ফিশার (Fritz Fischer) মনে করেন যে ১৯১১ সাল থেকে জার্মানি যুদ্ধ চেয়েছিল এবং তার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ করে ১৯১৪ সালে পরিপূর্ণ যুদ্ধ বাধাবার ব্যবস্থা করেছে। এই মতকেও অনেকে একপেশে মনে করেন। কারও কারও মতে প্রাশিয়াতে যেমন জঙ্গী ইয়াংকাররা ছিল সেই রকম ফ্রান্সে ছিল দেরুল্যাঁদের উগ্রজাতীয়তাবাদী অনুগামীরা। ইংল্যান্ডে সেইরকম ছিল দৃঢ় সঙ্কল্প সাম্রাজ্যবাদীরা, আর রাশিয়ায় ও আমেরিকায় ছিল সুনিশ্চিত যুদ্ধবাজরা। ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা মনে

করেন যে আঁতাত শক্তিবর্গ জার্মানি ও কেন্দ্রীয় শক্তিগুলিকে ঘিরে ফেলতে চেয়েছিল। তাই আগের থেকেই কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গ ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করেছে। পক্ষান্তরে এও বলা যায় যে ইংল্যান্ড বার্লিন বাগদাদ রেল ব্যবস্থা, কিয়েল ক্যানেল, জার্মান নৌ-আইন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে বিপজ্জনক জুজুকে (spectre) দেখতে পারছিল তার প্রভাবে তার মানসিকতার মধ্যে একটা যুদ্ধতৎপরতা এসে গিয়েছিল। যার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের লড়াই। এ লড়াইয়ের একটা সামগ্রিক রূপ আছে। তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না।

৪(গ).১২ যুদ্ধ শেষের প্রস্তুতি : উড্রো উইলসনের চৌদ্দদফা শর্ত

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে মানুষের মনে এসেছিল শান্তির আকাঙ্ক্ষা এবং যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা (revulsion)। এইরকম বিশ্বজনমতকে প্রাধান্য দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (Woodron Wilson) পৃথিবীতে যুদ্ধ শেষের পরবর্তী শান্তি নীতি কি হবে তা স্থির করে দিয়েছিলেন তাঁর চৌদ্দ দফা শর্তে (Fourteen Points)। তিনি বলেছিলেন যে এর পর থেকে শান্তির ইস্তাহার প্রকাশ্য আলোচনার মাধ্যমে স্থির হবে— "Open covenants of peace openly arrived at"; প্রত্যেক দেশ নিজেদের গার্হস্থ্য নিরাপত্তাকে অটুট রেখে নিজেদের অস্ত্রসম্ভারকে ন্যূনতম বিন্দুতে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করবে— "Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety", সমস্ত উপনিবেশ সংক্রান্ত দাবি নিরপেক্ষ নির্ধারণ ও মীমাংসা করতে হবে— A free, open minded and absolutely impartial adjustment of all colonial claims". তাছাড়া তিনি বলেছিলেন যে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিকে তার নিজের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার দিতে হবে। এইটিই হল বিখ্যাত জাতীয় সৌভাগ্য নির্ধারণের নীতি (The principle of National Self determination)। তিনি বলেছিলেন স্বাধীন পোল্যান্ড (Poland) ইউরোপের মানচিত্রে ফিরিয়ে আনতে হবে, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর মানুষদের নিজেদের মতন করে তাদের রাষ্ট্র গড়তে দিতে হবে এবং যুদ্ধ শেষে পৃথিবী ছোট বড় সমস্ত রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক নিরাপত্তাকে বজায় রাখার জন্য পৃথিবীর সব দেশের এক সম্মিলিত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যতে এর থেকেই জন্ম নিয়েছিল লীগ অফ নেশনস্ (League of Nations)। এই নীতিগুলি সার্থকভাবে প্রতিপালিত হবে এই বিশ্বাসে জার্মানি তার অস্ত্র সংবরণ করেছিল। বাস্তবে অবশ্য শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

৪(গ).১৩ ১৯১৯ সালের শান্তি ব্যবস্থা

চার বছর ধরে যে যুদ্ধ চলেছিল তার শান্তি ফিরিয়ে আনতে চার বছরের বেশি সময় লেগেছিল। এইভাবে যে শান্তি ব্যবস্থা চার বছর ধরে তৈরি করা হয়েছিল তার সূচনা হয় ১৯১৯ সালে। এইজন্য এই ব্যবস্থাকে বলা হয় ১৯১৯ সালের শান্তি ব্যবস্থা (The Peace settlement of 1919)। উড্রো উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্ত ও নিম্নলিখিত চুক্তিগুলিকে নিয়ে শান্তি ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল—

ক) জার্মানির সঙ্গে স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Verssailles)— ১৯১৯ সালের জুন মাস।

খ) অস্ট্রিয়ার সঙ্গো স্বাক্ষরিত সাঁ জারমেন-এর চুক্তি (Treaty of St. German)— ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস।

গ) হাঙ্গোরীর সঙ্গো স্বাক্ষরিত ট্রিয়াননের চুক্তি (Treaty of Trianon)— ১৯২০ সালের জুন মাস।

ঘ) তুরস্কের সাথে স্বাক্ষরিত লোমানের চুক্তি (Treaty of Lausanne)— ১৯২৩ সালে জুলাই মাস।

ঙ) বুলগেরিয়ার সাথে স্বাক্ষরিত নিউলির চুক্তি (Treaty of Neuilly)— ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাস।

১৯১৮ সালের শরৎকালে হাঙ্গোরী অস্ট্রিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে সাঁ জারমেন ও ট্রিয়াননের চুক্তি দুটি স্বতন্ত্র চুক্তি হিসাবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চুক্তি ছিল ভার্সাই-এর চুক্তি যার দ্বারা রাষ্ট্রকে চারিদিকে ছোট ছোট করে দেওয়া হয়েছিল, তার বিমান ও নৌবহর কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তার সৈন্য বাহিনীকে নিরঙ্কুশভাবে ছোট করা হয়েছিল, এবং তার ুপর বিপুল ক্ষতিপূরণ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, জার্মানি এ চুক্তিকে মেনে নিতে পারেনি—তাকে আরোপিত চুক্তি বা Dictated peace বলে বর্ণনা করেছিল। পরবর্তীকালে জার্মানি এই চুক্তি ভেঙ্গো ফেলার চেস্টা করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভার্সাই চুক্তির অঙ্গা হিসাবে গড়ে উঠেছিল বিশ্বসংগঠন—জাতিসংঘ (League of Nations)। এই সংগঠনের ইস্তাহার (covenant) ভার্সাই চুক্তিপত্রের সংযুক্ত বিষয় ছিল।

৪(গ).১৪ ফলাফল

ব্যাপক ধ্বংস ও হত্যালীলার মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল। রাশিয়া হারিয়েছিল কুড়ি লক্ষ মানুষ, জার্মানির কুড়ি লক্ষ, ফ্রান্স ও তার উপনিবেশগুলির পনেরো লক্ষ, অস্ট্রিয়া হাঙ্গোরীর সাড়ে বারো লক্ষ এবং ইংল্যান্ড ও তার উপনিবেশগুলির দশ লক্ষ মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হারিয়েছিল একলক্ষ পনেরো হাজার মানুষ। ব্যাধি, আতঙ্ক, স্নায়ুর রোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়েছিল কত মানুষ তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। যুদ্ধের সময় থেকে খাদ্যাভাব, যুদ্ধের পরে কর্মহীনতা ও অর্থাভাব সমস্ত ইউরোপ ও পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল। মানুষের নৈতিকতাবোধ, পরিবার সংগঠন ও সমাজকল্যাণের চিরায়ত নীতিগুলির উপর নির্মম আঘাত হেনেছিল যুদ্ধ। যুদ্ধের চাহিদা মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিকে বাড়িয়ে বিজ্ঞানকে প্রযুক্তিতে প্রয়োগ (application of science to technology) করে শিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছিল ঠিকই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অভিনব ধ্বংসের উদ্ভাবনেই বেশি কাজে লেগেছিল। দেখা গেছিল যে ১৯১৪ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে প্রত্যেক এক মিনিটে একজন ফরাসীর মৃত্যু হয়েছে। ইংল্যান্ডে উনিশ শতকের শেষ সিকিভাগ সময়ে যে প্রজন্মের জন্ম হয়েছিল তার অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এই যুদ্ধে।

সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ নারীমুক্তির সাহায্য করেছিল ("In every country, too, the war had the effect of accelerating the emancipation of women..."—David Thompson, *Europe since Napoleon*)। যুদ্ধের ফলে পুরুষদের মৃত্যু হয়েছিল বেশি তাই দেখা দিয়েছিল 'পুরুষ ঘাটতির' — 'deficit of men'— সমস্যা। ফলে বাধ্য হয়ে মেয়েদের অফিস-কাছারি, কলকারখানা, শিক্ষালয় হাসপাতাল সর্বত্র পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে হয়েছিল। এই কারণে ইংল্যান্ডে ১৯১৮ সালের তিরিশ বছর বয়স্ক বা তদূর্ধ বয়স্ক মহিলাদের পার্লামেন্টে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়।

যুদ্ধের প্রয়োজনে নতুন শিল্প গড়ে উঠেছিল। তুলোর বিকল্পে সেলুলস (cellulose) আবিষ্কার করা হয়েছিল। রেয়ন, প্লাসটিক প্রভৃতি বিকল্প শিল্প (Substitute industry) গড়ে উঠতে লাগল। চিলি (Chile) থেকে নাইট্রেট (Nitrate) আমদানি সম্ভব হচ্ছিল না বলে জার্মানি ইহুদি বৈজ্ঞানিক ফ্রিৎজ হেবার (Fritz Haber) বায়ু থেকে নাইট্রোজেন আহরণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

যুদ্ধের পর থেকে দেশে শ্রমিক আন্দোলন বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন (Trade Union) আন্দোলন করতে থাকে। সমাজতন্ত্রের অগ্রগমন ঘটে। রাশিয়াতে জারতন্ত্রের পতন হয়ে সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ ও পরবর্তীকালে আরোপিত ক্ষতিপূরণের চাপে জার্মান অর্থনীতি ভেঙ্গে যায় এবং জার্মান মুদ্রা জয়েসমার্কের মূল্য কমতে থাকে। সেই বিপর্যস্ত অর্থনীতি থেকে জন্ম নেয় জাতীয়তাবাদী নাৎসী (Nasi) দল। যুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। একের পর এক সরকার বদল ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে হাঙ্গেরীর কৃষি ও শিল্প নিয়ে দ্বন্দ্ব মধ্য ইউরোপে এক বিপজ্জনক অস্থিরতা এনে দিয়েছিল। ইউরোপের মানচিত্রে পোলান্ডের পুনরাবির্ভাব হয়েছিল। সার্বিয়া মিলিয়ে গেল ইয়োগোস্লাভিয়া নামক নতুন এক যৌগিক রাষ্ট্রের ভেতর। আর উত্তরের স্লাভরা—চেক ও স্লোভাকরা—চেকোস্লোভাকিয়া গঠন করল। রুমানিয়া রাশিয়ার কাছে বেসারবিয়া নামক অঞ্চল লাভ করে নিজের আয়তনকে দ্বিগুণ করে ফেলল। অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ (Hapsburg) সাম্রাজ্য ছোট হয়ে গেল। জার্মানির সঙ্গে তার মিলন নিষিদ্ধ হল। বিজিত রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশগুলি লীনের অধীনে ম্যানডেটেড টেরিরিস্'-এ (Mandated Territories) পরিণত হয় মিত্র শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। এর পর থেকে ব্রিটেন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপনিবেশগুলিতেও স্বাধীনতার আন্দোলন বাড়তে লাগল। ফলে ইউরোপের সনাতন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির যে নিয়ন্ত্রণ উপনিবেশগুলির উপর ছিল তা শিথিল হয়ে পড়ল। বাল্টিক অঞ্চলে এস্টোনিয়া (Estonia), লাটভিয়া (Latvia) এবং লিথুয়ানিয়া (Lithuania) স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল। আলবেনিয়াকেও স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হল। তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেলে পর সিরিয়া (Syria) এবং লেবানন (Lebanon) ফরাসীদের অধীনে 'ম্যানডেটেড' (Mandated) অঞ্চলে পরিণত হল, ব্রিটেনের 'ম্যানডেটেড' অঞ্চল হল প্যালেস্টাইন, ইরাক ও ট্রান্স জোরডান (জোরডান নামে বর্তমান দেশ)। ১৮৭০ সালে সেদানের যুদ্ধের ফলে জার্মানি ফ্রান্সের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল আলসস্ ও লোরেন নামক অঞ্চল (Alsace & Lorraine), তা ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। এর দ্বারা ইউরোপের মানচিত্রের পরিবর্তন হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ভেতরে ভেতরে নানা অসন্তোষ নানাভাবে জমে উঠেছিল। এর পর দুধরণের মানসিকতা ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করেছিল। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলি যেমন জার্মানি ও অস্ট্রিয়া যাদের রাজ্যাংশ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তারা সমস্ত ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও সংশোধন (revision) চাইতে শুরু করল। অন্য দিকে ফ্রান্স প্রভৃতি যে সব দেশ কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির দুর্বলতাই তাদের সুরক্ষার প্রধান শর্ত বলে ধরে নিয়েছিল তারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠল। আবার বলকান অঞ্চলের সদ্য আত্মপ্রকাশ করা দেশগুলি অস্ট্রিয়া থেকে বা তুর্কী সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হয়েছিল বলে তাদের অস্ট্রিয়া বা তুর্কী বিরোধিতা যেমন প্রকট ছিল তেমন নিজেদের মধ্যে সন্দেহ ও বিদ্বেষ প্রবল থাকায় বলকান অঞ্চলে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষের জন্য যে যুদ্ধ করা হয়েছিল তা কিন্তু শান্তির বনিয়াদ রচনা করতে পারেনি। আর এই অসার্থক বনিয়াদের উপর গড়ে তোলা শান্তির প্রয়াস দুদশক পরেই ভেঙ্গে যায়। ১৯৩৯ সালেই আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

৪(গ).১৫ সারাংশ

১৮৭০ সালের সেদানের যুদ্ধের সময় থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত চারদশকের কিছু অধিক সময় ধরে ইউরোপে সাধারণ অর্থে একটি মহাদেশীয় শান্তি বিরাজ করছিল। কিন্তু এই শান্তি ছিল বড়ই আপাত। ইউরোপ ত্রিশক্তির মৈত্রী (Triple Alliance) এবং ত্রিশক্তির আঁতাত (Triple Entente) এই দুই সশস্ত্র শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যে শক্তিসাম্য আত্মপ্রকাশ করেছিল তা শুধুই যুযুধান সশস্ত্র দুই শিবিরের অপরীক্ষিত ভারসাম্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দুভাবে এই ভারসাম্যের পরীক্ষা হতে পারত এবং দুভাবেই তা হয়েছিল। এক, বিসমার্কের ক্ষমতা থেকে পতনের পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের নেতৃত্ব জার্মানি নৌবাদ ও বিশ্বনীতির লক্ষ্যকে তুলে ধরলে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে জার্মানি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে—জার্মানি পৃথিবীর উপনিবেশ বণ্টনের সংশোধন চাইছে। এতে কোন সন্দেহ ছিল না যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স প্রাণপণে এই সংশোধন প্রয়াসকে রোধ করবে এবং সেই প্রতিরোধে লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং সে লড়াই হবে বিধ্বংসী কারণ ইংল্যান্ড তার শ্রেষ্ঠ নৌবাহিনী নিয়ে আর জার্মানি তার অত্যন্ত দক্ষ ও দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনী নিয়ে নিজের নিজের লক্ষ্যে অনড় থাকবে। দুই ইউরোপে অটোম্যান তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাচ্ছিল এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী দ্বৈত, রাজতন্ত্রে (Dual monarchy) ভাঙ্গন দেখা যাচ্ছিল। ফলে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের স্লাভদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। রাশিয়া সমস্ত অর্থেই জাতীয়তাবাদী স্লাভ (Slave) মানুষদের সমর্থন জানালেও অস্ট্রিয়া ছিল তাদের স্বপ্নপূরণের প্রতিবন্ধক। দুনিয়া জুড়ে জার্মানির উদ্বোধিত জাতীয় চেতনা ইংল্যান্ড ফ্রান্সের স্থিতিশীল অহংবোধে আঘাত হানছিল অন্যদিকে মহাদেশীয় ভূখণ্ডে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যবাদী দর্প ও ষড়যন্ত্র স্লাভদের জাতীয় চেতনাকে লাঞ্ছিত করছিল। জার্মানির মতন স্লাভরাও চাইছিল সংশোধন নিজেদের বিকীর্ণ অস্তিত্বকে সংহতি দানের জন্য চলতি ব্যবস্থার পরিবর্তন। এই দুই বিশেষ অর্থে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল সংশোধনবাদের সঙ্গে সংরক্ষণবাদের দ্বন্দ্ব। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধের জন্য প্রকৃত অর্থে দায়ী কে তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যাবে না। ইংল্যান্ড ঘোষণা করেছিল যে সে ক্ষুদ্রজাতিগুলির রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। জার্মানি ঘোষণা করেছিল যে সে তার জাতীয় বিধিলিপির মর্যাদা সংরক্ষণে যুদ্ধের পথ বেছে নিচ্ছে। কিন্তু আড়ালে উভয়ের ছিল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কলহ কূটনীতির দ্বারা যার নিষ্পত্তি সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ ছিল অনিবার্য আর সেই ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকেই প্রথম বিশ্বযুদ্দের অনস্বীকার্য যুক্তি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

৪(গ).১৬ প্রশ্নাবলী

১) *দশটি* বাক্যে উত্তর দিন ঃ

ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কি জার্মানি দায়ী?

খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূল রণক্ষেত্রগুলি বর্ণনা করুন।

গ) ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে বলকান যুদ্ধ কেন হয়েছিল?

ঘ) ওয়েল্টপলিটিক কি?

ঙ) নৌবাদ কি?

চ) 'যুদ্ধ শেষের যুদ্ধ'—তাৎপর্য লিখুন।

ছ) উড্রো উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্ত কি?

জ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির অবস্থা বর্ণনা করুন।

ঝ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে মরোক্কো নিয়ে কি সংকট হয়েছিল?

ঞ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির নৌবাহিনীর ভূমিকা কি ছিল?

২। *পাঁচটি* বাক্যে উত্তর দিন ঃ

ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য ইংল্যান্ড কতখানি দায়ী ছিল?

খ) বাগদাদ রেলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি?

গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের কি পরিবর্তন হয়েছিল?

ঘ) নারীমুক্তির উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব কি ছিল?

ঙ) শিল্প ব্যবস্থার উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব কি ছিল?

চ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নতুন অস্ত্র কি ব্যবহার করা হয়েছিল?

ছ) জনসংখ্যার (population) উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব কি হয়েছিল?

জ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির নৌ অবরোধ থেকে ইংল্যান্ড মুক্তি পেল কি করে?

ঝ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় অস্ট্রিয়ার প্রত্যক্ষ ভূমিকা কি ছিল?

৩। *একটি* বাক্যে উত্তর দিন ঃ

ক) উড্রো উইলসন কে ছিলেন?

খ) জলযুদ্ধে কনভয় (convoy) ব্যবস্থা কি ছিল?

গ) কিয়েল ক্যানেল কি?

ঘ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানির সঙ্গে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

ঙ) নিউলির চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

চ) ব্রুসিলভ কে ছিলেন?

ছ) চৌদ্দদফা শর্তের যে কোন একটি শর্ত কি ছিল?

জ) কোন কোন দেশ বা অঞ্চল নিয়ে ইউগোস্লাভিয়া গঠিত হয়েছিল?

ঝ) আগাদি কোথায় অবস্থিত ?

ঞ) হেগ সম্মেলন কি?

ট) সার্বিয়াকে অস্ট্রিয়া যে চরমপত্র দিয়েছিল তার একটি শর্ত লিখুন।

ঠ) পূর্ব সীমান্তে জার্মানির লক্ষ্য কি ছিল?

ড) বুলগেরিয়া কোন পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল?

ণ) যুদ্ধের শুরুতে ইটালীর ভূমিকা কি ছিল?

৪(গ).১৭ গ্রন্থপঞ্জী

১. N. Mansergh, *The Coming of the First World War 1878-1914.*

২. E. Brandenberg, *From Bismarck to world war : A History of German Forign Policy.*

৩. James Joll, *Europe since 1870 and International Relations.*

৪. A. Rosenbery, *The Brith of German Republic.*

৫. S. B. Fay, *The Origins of the World War* (2 Vols.)

৬. H. Nicolson, *Peacemaking 1919.*

৭. P. T. Moon, *Imperialism and World Politics.*

৮. E. M. Farle, *Turkey, the Great Powers, and the Baghdad Railway.*

৯. W. Miller, *The Ottoman Empire and its successors, 1801-1927.*

১০. W. L. Langer, *The diplomacy of Imperialism 1890-1902.*

১১. E. L. Woodward. *Great Britain and the German Navy.*

১২. C. R. M. F. Cruttwell, *A History of the Great War, 1914-1918.*

১৩. B. H. Liddell Hart, *A History of the World War, 1914-1918.*